আজকের কাগজ

তারিখ ...22 OCT 1992 ... ...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ৩ ...

এনসিটিবি— প্রস্তাবিত উচ্চ মাধ্যমিক গদ্য ও কবিতা সংকলন বিষয়ে কিছুকথা

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

বর্তমান পত্রিকায় টেকস্ট বুক বোর্ড প্রণীত উচ্চ মাধ্যমিক 'বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থখানি বেশকিছু দিন আগে আলোচনা করেছিলাম। বইটি পড়তে ও পড়াতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, এর অন্তর্গত রচনার নির্বাচন, সেগুলির মুদ্রণ, প্রয়োজনীয় টীকাভাষ্য রচনা— কোথাও কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার পরিচয় দেননি। তাই প্রস্তাব করেছিলাম, প্রচলিত বইটি প্রত্যাহার অথবা বাতিল করে নতুন একটি সংকলন প্রস্তুত করার, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা একটি ভালো, সুনির্বাচিত ও সুসম্পাদিত পাঠ্যবই পায়। আমার যে লেখা 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি'র মনঃসংযোগ কেড়েছে কি-না জানি না। তবে এতো দিন পর একটি ভিন্ন সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করছি।

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে সম্প্রতি একটি চিঠি এসেছে (দ্রঃ স্মারক সংখ্যাঃ এনসিটিবি (সি)/২ই-২৩১/৫/৩০৫৫/১৫০; তারিখ ৩/৯/৯২)। ওই পত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে, এনসিটিবি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলা আবশ্যিক বিষয়ের জন্য গদ্য ও কবিতায় দু'টি পৃথক সংকলন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছে।' পত্রের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মত চেয়ে একটি 'প্রশ্নোত্তরিকা' পাঠানো হয়েছে এবং সরবরাহ করা হয়েছে প্রস্তাবিত সংকলকদ্বয়ে গৃহীত হবে এমনসব কবি- লেখকের নাম ও তাঁদের রচনার শিরোনামা। গদ্যাংশে স্থান পেয়েছেন পঞ্চাশজন লেখক আর পদ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ষাটজন কবির কবিতা।

উল্লিখিত পত্র, 'প্রশ্নোত্তরিকা' 'যাচাইপত্র' বেশকিছু সত্য তুলে ধরেছে। [এক] ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ১৯৯২ সালের শেষ দিকে। অর্থাৎ দীর্ঘ চোদ্দ বছরের বেশি সময় এনসিটিবি শীত নিদ্রায় কাটিয়েছেন। শিক্ষা বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মতো এমন একটি অতীব জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়কে কর্তৃপক্ষের এতোকাল অবহেলা ও অমান্য করার কারণ কী। হয়তো যুক্তি হিসেবে দেশের রাজনেতিক কারণের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সে-যুক্তি কতখানি গ্রাহ্য ও বাস্তব তাও ভাবার বিষয়।

[দুই] প্রস্তাবিত সংকল দুটির নির্বাচক ও সম্পাদকমন্ডলীর পরিচয় অজ্ঞাত। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সংকলন ও সম্পাদনা সবার কম্ম নয়। জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, দেশের খ্যাতিম্যান ও মেধাবী শিক্ষকবৃন্দই সাধারণত সে-কাজ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য একান্তভাবেই আমাদেরই মুদ্রাচিহ্নিত। এক্ষেত্রে আমরা কাউকে আদর্শ মানি না, কারোর ঋণও স্বীকার করি না। অধিকার বহির্ভূত এলাকায় পদচারণা অর্থাৎ, সীমা লংঘন করতে আমাদের জুড়ি নেই। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে যে বইটি পড়ে আসছে তাতেও সম্পাদক-সংকলকের পরিচয় নেই। এর ফলে সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই হয়েছে। এর যা দোষ, দুর্বলতা, ত্রুটি কিংবা অপূর্ণতা- সবকিছুর দায়িত্ব ঢালাওভাবে এনসিটিবিকেই বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সম্পাদক-সংকলকদের পরিচিত করলে দায়-দায়িত্ব তাদেরকেও সমভাবে বহন করতে হতো। তখন তাঁরাও নিন্দিত অথবা প্রশংসিত হতেন। তাই বলছি, এনসিটিবি আমাদের অন্ধকারে না রাখলেও পারতেন বরং তাতে তাঁদের কার্যই আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে সবার নৈতিক সমর্থন পেতো।

[তিন] এনসিটিবি আগে থেকেই নির্বাচন দিয়েছেন। তারপর সেই নির্বাচিত রচনাগুচ্ছের ওপর অভিমত সংগ্রহ করছেন। এ অবস্থায় মতামত অনেকাংশে প্রভাবিত হবে। হাতের কাছে ও চোখের সামনে আমরা যা- দেখছি আমাদের অধিকাংশই সে আলোকে সিদ্ধান্ত দেবো। স্বাধীন চিন্তার সুযোগ এতে কম থাকবে। এনসিটিবির-এ আচরণ অন্যভাবেও ব্যাখ্যাযোগ্য। তাঁরা আমাদের তোয়াক্কা না করেই রেগুলেশন জারি করেছেন। অতঃপর দলীয় সাংসদ ও সরকার অনুগত বিরোধী দলের সাহায্যে তা যেন জায়েজ করতে চাচ্ছেন।

এনসিটিবি-র 'রচনা নির্বাচন রীতি' ও প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির মধ্যেও কথা ও কাজের মিল না থাকার মতো অসঙ্গতি লক্ষ্য করছি। 'রচনা নির্বাচন রীতি'র দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ (ক) সংখ্যক রীতিতে বলা হয়েছে ঃ 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দু'জন বিশিষ্ট গদ্য লেখকের .... ২টি রচনা' থাকবে। অথচ পাণ্ডুলিপিতে মাত্র একজন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামই পাচ্ছি। ফোর্ট উইলিয়াম গোষ্ঠীর গদ্য চর্চার পরিচয় দিতে হলে আগেই বিদ্যাসাগর কেনো? এখানে প্রথমেই কেরি-র কথা আসা উচিত। কেননা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর কথোপকথনে আশ্রিত আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা লৌলিক বুলি বাংলা গদ্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। একথা ঠিক, বিদ্যাসাগর এসেই বাংলা গদ্য 'কলামন্ডিত' হয়েছে। তিনিই এক অর্থে বাংলা গদ্যের স্থপতি। ফোর্ট উইলিয়াম পর্যায়ের একজন লেখক নির্বাচন করলে বিদ্যাসাগরকেই নিতে হয়। কিন্তু প্রস্তাবনায় দু'জনের কথা বলে একজনকে গ্রহণ করলে নির্বাচকমন্ডলীর স্মৃতিভ্রংশের পরিচয়ই তাতে উৎকীর্ণ হয়। আমার মতে, উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন'-এর অংশবিশেষ এবং বিদ্যাসাগরের কোনো রচনা নির্বাচিত করাই যুক্তিসিদ্ধ।

'সাহিত্য সংকলন' গদ্য-এর জন্যে ধর্মবিষয়ে দু'টি রচনা মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'রমজান' এবং মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর 'বিদায় হজ' গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচন নীতিমালায়ও [১৩(জ)] ধর্ম বিষয়ক রচনা স্থান পাবার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো স্ববিরোধিতাও নেই। তৎসত্ত্বেও বলবো, শিক্ষার্থীরা এ জাতীয় বক্তব্য, রচনা তাদের ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ প্রভৃতি পত্রে পাঠ করে আসছে। মাধ্যমিক পর্যায়েও তারা তা পড়ে এসেছে। সেক্ষেত্রে চর্বিত চর্বণে লাভ কী। না আমি ধর্ম বিষয়ক রচনা পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেয়ার মোটেও বিরোধী নই। আমি মনে করি, একেবারে ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ না-করে বরং আমরা এমন সব রচনা পাঠের ব্যবস্থা করি যেগুলির আভ্যন্তর বক্তব্য, গলন হলে পাত্র-পাত্রীদের জীবনবোধ ও জীবনাচরণে একান্তভাবেই ধর্মনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ হোক, আর তাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই ধর্মকে তাদের জীবনের অনিবার্য অংশরূপেই গ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া 'বিদায় হজ' অনেকদিন পাঠ্য ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ শ্রেণীর প্রবন্ধ সংকলনেও তা গৃহীত হয়েছে। এ জাতীয় নতুন কোনো রচনা নির্বাচন করাই তাই ভালো। বুদ্ধদেব বসুর রচনা হিসেবে নেয়া হয়েছে 'আমার ছেলেবেলা'। বুঝতেই পারছি গ্রন্থটির কিছু অংশ হয়েছে সমাদৃত। এই আত্মজীবনী, তাও যাতে জীবনের প্রথম পর্যায়ের পরিচয়ই দেয়া হয়েছে— তাতে কি বিশিষ্ট গদ্যলেখক, মেধাবী সমালোচক ও বিপুল বৈদগ্ধ্যের বুদ্ধদেবকে আবিষ্কার করা যায়? তার চেয়ে 'কালের পুতুলে'র কোনো রচনা কি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় হতো না?

আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী'-/কে কেনো নির্বাচিত করা হলো বুঝলাম না। উপন্যাসটি আমাদের গর্ব, আমাদের সমাজ-বাস্তবতায় বিশ্বস্ত এক সামাজিক দলিল। কিন্তু বিষয়-ঐশ্চর্য বাদ দিলে এর রচনা রীতির কোনো কালাতিক্রমী পরিচয় আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে এ সংকলনে খন্ডিত আকারে আবু ইসহাককে তুলে না ধরে তাঁর 'সূর্যদীঘল বাড়ী'কে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করলেই তাঁকে বেশি সম্মানিত করা হবে। এ জন্যে 'লালসালু' বাদ দেয়ার দরকার নেই। একটির বিকল্প হিসেবে অপরটিকে পাঠ্যভুক্ত করলেই হয়। মাধ্যমিক পর্যায়েও একাধিক উপন্যাস থেকে একটি পড়ারই বিধান দেয়া হয়েছে।

জসীমউদ্‌দীন কি সত্যিই আমাদের গদ্যসাহিত্যে কোনো নতুন মাত্রা যোগ করেছেন? গদ্য লেখক জসীমউদ্‌দীনের চেয়ে কবি জসীমউদ্‌দীন অনেক বড়ো। আমরা কার কথা ভাববো যে কবি আমাদের গ্রামবাংলার জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, নিসর্গ ও জীবন সংগ্রামকে তাঁর কাব্যে, কবিতায় অনির্বচনীয় শব্দরূপ দিয়েছেন সেই

দু'জনের কাউকে 'ছোট কিংবা বড়ো' মুসলমান কিংবা হিন্দু, জমিদার কিংবা সর্বহারা রূপে উল্লেখ করার মতো পাপাচারে আমি লিপ্ত হবো না। আমি শুধু বলছি, রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে হলে বলাকার পরও পথ চলার শ্রম স্বীকার করতে হয়। 'পুনশ্চ' কে ভুলে গেলে তার কবিসত্তায় একটি পরিচয় অনাবিষ্কৃতই থাকে। আবার ত্রিশ-উত্তর কালের স্বতন্ত্র আঙ্গিকের কবিতার পুরোভূমিকেও এর ফলে অস্বীকার করতে হয়। নজরুলকেও তার স্বদেশ সংলগ্ন সমকালের আবেগদীপ্ত, গণমানবপ্রেমী ও ঐতিহ্যলগ্ন পরিচয় সহ-ই তুলে ধরতে হবে।

P.T.O.

আজকের কাগজ
তারিখ 22 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

পল্লীপ্রাণ কবি চৈতন্যকে–না অবসরে, মনের একান্ত খেয়ালে যে মানুষটি কিছু গদ্যের চর্চা করেছেন সেই জসীমউদ্‌দীনকেই প্রথম জসীমউদ্‌দীন দ্বিতীয় জসীমউদ্‌দীনের চেয়ে অনেক মহান, মৃত্যু–উর্ধ্ব জীবনের অধিকারী এক কবিপুরুষ। সুতরাং গদ্যাংশে তাঁকে টেনে এনে বিব্রত না করাই তো ভালো ছিলো।

'সাহিত্য সংকলন' (কবিতা)–র জীবনানন্দ দাশের 'আবার আসিব ফিরে', বন্দে আলী মিয়ার 'ময়নামতির চর' এবং হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' কবিতাত্রয় সুনির্বাচিত বলে মনে হয়নি। 'ঝরা পালকে'র সনেটগুচ্ছের মধ্যে জীবনানন্দ প্রতিভার উত্তাপকে খুঁজে পাওয়া গেলেও সেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার বেধ ও বিস্তার এখানে নেই । পরবর্তী কাব্যসমূহেই জীবনানন্দ তার কবিচৈতন্যের প্রাতিস্বিক পরিচয়সহ প্রকাশিত। জসীমউদ্‌দীন বলয়ের বন্দে আলী, ঐতিহ্যানুরক্তির মধ্যেই মুক্তি খুঁজেছেন। 'উড়ানির চর' কিংবা 'ময়নামতির চরে'র ইমেজও তাকে সেই পরিচয়েই শিলীভূত করবে। হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' স্নাতক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) 'কবিতা সংকলনে' গ্রন্থবদ্ধ। বর্তমান সিলেবাসে কবিতাটি অন্তর্ভুক্তও। তাই বলছিলাম, এ তিনজন কবির রচনা সংকলনে এনসিটিবি পুনর্বিবেচনা করবেন।

এ অংশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে তিনটি– 'সোনার তরী' 'মুক্তি' ও 'ঝড়ের খেয়া' । নজরুলের জন্যেও ওই একই বরাদ্দ। তাঁরও 'দারিদ্র্য,' 'কোরবানী' এবং 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' পত্রস্থ হবে। সংখ্যা গণনাভিত্তিক সমতার এক বিচার চমৎকার। দু'জনের কাউকে 'ছোট কিংবা বড়ো' মুসলমান কিংবা হিন্দু, জমিদার কিংবা সর্বহারা রূপে উল্লেখ করার মতো পাপাচারে আমি লিপ্ত হবো না। আমি শুধু বলছি, রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে হলে বলাকার পরও পথ চলার শ্রম স্বীকার করতে হয়। 'পুনশ্চ' কে ভুলে গেলে তার কবিসত্তায় একটি পরিচয় অনাবিষ্কৃতই থাকে। আবার ত্রিশ–উত্তর কালের স্বতন্ত্র আঙ্গিকের কবিতার পুরোভূমিকেও এর ফলে অস্বীকার করতে হয়। নজরুলকেও তার স্বদেশ সংলগ্ন সমকালের আবেগদীপ্ত, গণমানবপ্রেমী ও ঐতিহ্যলগ্ন পরিচয় সহ–ই তুলে ধরতে হবে। দু–জনের আরো একটি–দু'টি কবিতা তাই গ্রহণের জন্যে এনসিটিবি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পুনশ্চ

এনসিটিবি'র যেসব কাগজ সংগ্রহ করা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষার চর্চায় তারা খুবই স্বাধীন। সন্ধি–সমাসবদ্ধ পদকে তাঁরা ' ইচ্ছে মতো লিখতে পারেন সহজে। অংশবিশেষ সহ 'অংশবিশেষ সহ', রচনা রীতি 'রচনারীতি' যুক্তিসমৃদ্ধ 'যুক্তি সমৃদ্ধ' বাঞ্ছনীয় 'বাঞ্চ(ঞ+চ)নীয়' গঠনমূলক 'গঠন মূলক' চণ্ডীদাস 'চন্ডী (ন+ড+ঈ) দাস' এমনকি 'নির্ভুল', প্রমাণিত, 'প্রমাণীত' লেখার মতো সাহস তাঁদের আছে। টাইপড কপিতে একটু–আধটু ভুল হয়েই থাকে। এ জাতীয় প্রমাদে তাই কিছু যায় আসে না। কথা হলো, শিক্ষা এবং জাতির জন্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন যে- প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁদের এ জাতীয় ভ্রান্তি থাকবে কেনো? আর কর্তা চাইলেও বুঝলে টাইপিস্টের সাধ্য কি ভুল করার।

অভিমত ডাকযোগে পাঠাতেই এনসিটিবি বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা করলাম না। কারণ; অসংখ্যের ভিড়ে, পদমর্যাদার অহংকারীদের দৌরাত্ম্যে আমার লেখা হারিয়ে যাওয়ার একটি অন্তর্গত ভীতিবোধ আমার রয়েছে। আমি তাই এভাবেই আমার অভিমত উপস্থাপন করছি। এনসিটিবি আমাকে মার্জনা করবেন।

ডক্টর জীনাত ইমতিয়াজ আলী : সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক, লেখক ও গবেষক। বর্তমানে ঢাকার আইডিয়াল কলেজে শিক্ষকতা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম'।